OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 24
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 182 - 188
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - ii, Published on April issue 2026, Page No. 182 - 188
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

সর্বকালের ইতিহাস : প্রসঙ্গ মহাশ্বেতা দেবীর দুটি ছোটগল্প

সুমন্ত দাস
গবেষক, বাংলা বিভাগ
সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়, পুরুলিয়া
Email ID: sumantadas133@gmail.com
0009-0008-2609-9439

Received Date *30. 03. 2026*
Selection Date *07. 04. 2026*

Keyword
Mahasweta Devi, Patan, Slavery, Stanadayini, Yashoda, Mother, Dead.

Abstract
Mahasweta Debi stands as one of the most distinguished literary figures of the modern era. She was a powerful and commanding voice among contemporary writers. In her numerous short stories, she gave voice to the exploited and marginalized people of society. In the realm of literature, she served as the representative of the oppressed masses. It was precisely because she acted as a literary advocate for the people at the lowest strata of society that she earned the title "Shabar Mata" (Mother of the Shabars). Her short stories are, each in its own right, living monoliths. Having withstood the rigorous test of time, her stories continue to be studied and celebrated today as pure, unadulterated gold. The stories 'Ajir' and 'Stanadayini' are no exceptions to this rule. Mahasweta Debi collectively referred to these two short stories as "The History of All Time." The central theme of 'Ajir' is the history of the buying and selling of human beings—a stark illustration of the institution of slavery. Even today, generations of descendants continue to suffer the consequences of the transgressions committed by their ancestors many years ago. During a time of severe drought, their forebears sold themselves into servitude merely to survive, believing that their descendants would never again face the hardships of hunger and homelessness. Yet, they failed to realize that with a single signature on a meagre deed of indenture, they were effectively signing away the very freedom of their future generations. Consequently, the anguish of the descendants intensified to a harrowing degree. As the narrative unfolds, this crisis within the story deepens in intensity. The core subject of the story lies in the arduous struggle undertaken by the protagonist, Patan—right up to the very end—to reclaim the lost essence of his soul and experience the true taste of freedom. On the other hand, in the short story 'Stanadayini', we witness a societal practice where affluent families would employ "wet nurses" to breastfeed their children, ensuring that the physical beauty and figure of the upper-class women of the household remained unblemished. The story also poignantly illustrates the extent to which human dignity and respect for one another can be eroded. After having nourished nearly fifty children at her breast, the protagonist ultimately found herself suffering in utter solitude. She battled the deadly scourge of cancer, yet even then, she found no one to stand

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 24
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 182 - 188
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

by her side; neither her own husband nor her children offered her support during her days of dire distress. Ultimately, Mahasweta Debi characterizes the death of Yashoda—a figure embodying the divine essence of a mother—as nothing less than the death of God Himself. Through these two stories, we explore how the eternal history of humanity is vividly brought to life.

Discussion

Subaltern শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ হল অধস্তন, ক্ষমতাহীন, নিষ্ক্রিয় বা সমাজের শোষিত ও প্রান্তিক গোষ্ঠী। প্রতিষ্ঠিত রূপে 'Subaltern Studies' এর জন্মের পূর্বেই বাংলা কথাসাহিত্যে এই Subaltern দের কথা যাঁরা তুলে ধরেছেন তাঁদের লেখায়; মহাশ্বেতা দেবী (১৯২৬ খ্রি. - ২০১৬ খ্রি.) তাঁদের মধ্যে অন্যতম প্রধান ব্যক্তিত্ব। রণজিৎ গুহ ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে 'Elementary Aspects of Peasent Insurgency In Colonial India' গ্রন্থে প্রথম পাকাপাকিভাবে 'Subaltern Studies' এর কথা প্রকাশ করার পূর্বে মহাশ্বেতা দেবী 'অরণ্যের অধিকার' (১৯৭৭ খ্রি.) উপন্যাসে Subaltern দের কথা তুলে ধরেছেন। কল্লোল যুগের বিশিষ্ট গল্পকার মনীশ ঘটক ওরফে যুবনাশ্ব এবং বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও সমাজকর্মী ধরিত্রী দেবীর সুযোগ্য কন্যা হলেন মহাশ্বেতা দেবী। খগেন্দ্রনাথ মিত্র সম্পাদিত 'রংমশাল' পত্রিকায় 'রবীন্দ্রনাথের ছেলেবেলা' নামক রচনাটির হাত ধরে ১৯৩৯ খ্রিষ্টাব্দে সাহিত্য জগতে পা রাখেন তিনি। কুড়ি-একুশ বছর বয়সে এম.এ. পাশ করার পর পিতা মনীশ ঘটক তাঁর বিয়ে দেন তৎকালীন নাট্যকার ও অভিনেতা বিজন ভট্টাচার্যের (১৯০৬ খ্রি. - ১৯৭৮ খ্রি.) সঙ্গে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মেয়ের বিয়ে দেওয়ার জন্য পিতার কাছে পাত্রের কর্মজীবনে সফল ও বিখ্যাত হওয়াটাই একমাত্র মাপকাঠি ছিল, নচেৎ বিজনবাবু ছিলেন মহাশ্বেতা দেবীর চাইতে প্রায় বছর বিশ-একের বড়। তাঁদের বিবাহের পরের বছরই পুত্র সন্তান নবারুণ ভট্টাচার্যের (১৯৪৮ খ্রি. - ২০১৪ খ্রি.) জন্ম হয়। মহাশ্বেতা দেবীর নানান স্মৃতিকথা মারফত জানা যায়,-

"বিজনদের পরিবার খুব গোছানো ছিল। বিজন কোনোদিনই নিয়মিত কোনো উপার্জন করে নি।"[১]

অর্থাৎ অসুখী দাম্পত্যের বিষবাষ্প তাঁদের জীবনের মধ্যে ঘনীভূত হচ্ছিল ধীরে ধীরে। পরিণাম স্বরূপ বিচ্ছেদ হয় তাঁদের বিবাহিত সম্পর্কের ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে। টালমাটাল জীবনে থিতু হওয়ার লক্ষ্যে মহাশ্বেতা দেবী আবার বিবাহ করেন ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে অসিত গুপ্তকে। কিন্তু তাঁর দ্বিতীয় বিবাহও বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। এগারো বছরের মাথায় আবার বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে মহাশ্বেতার জীবনে।

ব্যক্তিগত জীবনের সংঘর্ষের সমান্তরালে কর্মজীবনেও অস্থিরাবস্থা সঙ্গী ছিল মহাশ্বেতা দেবীর। কখনও স্কুলে শিক্ষকতা তো কখনও টেলিগ্রাফ অফিসের ক্লার্ক, কখনও বা ডাকঘরে চাকরি— কোনোটাতেই স্থায়ী হতে পারেননি তিনি। একের পর এক চাকরি খুঁইয়ে একসময় কাপড় কাচা সাবান বিক্রি, নিরক্ষরদের জন্য ইংরেজিতে চিঠি লিখে দেওয়ার মতো কাজও তিনি নির্দ্বিধায় করেছেন। শেষে বিজয়গড় কলেজে ইংরেজির অধ্যাপক হিসেবে ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে যোগদানের পর তাঁর কর্মজীবনে খানিক সুরাহা হয়। ছন্নছাড়া ঐ অস্থির অবস্থার সময় মহাশ্বেতা দেবীর লেখার প্রতি প্রবল আকর্ষণই তাঁকে শক্তি জুগিয়েছে ক্রমাগত। তাঁর ভাষায়, -

"ততোদিনে আমি ঠিক করে নিয়েছি, যে কোনো ভাবে লেখা আমাকে চালিয়ে যেতেই হবে।"[২]

এই অদম্য মানসিকতাই তাঁকে 'সুমিত্রা দেবী' বা 'খুকু' থেকে 'শবর মাতা'তে পরিণত করেছিল।

নকশাল আন্দোলনের সূত্রপাত হয় ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দের ২৫ মে। এই আন্দোলনের সময়কাল থেকেই বাংলা সাহিত্যে নিম্নবর্গ ও বঞ্চিত মানুষদের কথা বেশি করে উঠে আসে। শুধুমাত্র বৃহৎ দলিত সমাজ কিংবা আদিবাসী, — এই তকমাই আটকে থাকেনি তারা মহাশ্বেতা দেবীর লেখালেখিতে। তারা স্ব স্ব জাতির একজন হয়ে উঠেছে। আর এখানেই মহাশ্বেতা দেবীর রচনাশৈলীর মুখ্য আকর্ষণ বিন্দুটি বর্তমান। নির্মেদ, কঠোর ও তীক্ষ্ণ ভাষা সম্বলিত তাঁর লেখায় পাঠক আজও মুগ্ধ হয় অব্যর্থ রূপে। তাঁর রচিত চরিত্রদের অভীষ্ট লক্ষ্য ব্যতীত বিষয়ে অনাসক্ত মনোভাব পাঠকদের মনোজগতকে বিশেষভাবে আন্দোলিত করে। 'The voiceless Section Of Indian Society'-র 'The voice' হয়ে উঠেছেন তিনি। রোটি-কপড়া-মকানের নিরাপত্তা যাদের নেই, শিক্ষা-স্বাস্থ্য ইত্যাদি সভ্য সমাজের বৈশিষ্ট্য সূচক বিষয়গুলিকে যাদের সঙ্গে পরিচিত হতে

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 24
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 182 - 188
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

দেওয়া হয়নি দীর্ঘকাল; সেইসব প্রান্তিক, অচ্ছ্যুত অনার্য কোল-ভীল-মুণ্ডা-সাঁওতাল ইত্যাদি জাতির মানুষদের, বিশেষত নারীদের মহাশ্বেতা তুলে ধরেছেন তাঁর সাহিত্যে। ভারতবর্ষে ইতিহাস লেখার চল যখন শুরু হয়, তখন থেকেই কলমের হাতটি ছিল শাসকের। কাজেই ইতিহাসের ভাষ্যটি হয়ে দাঁড়ায় শাসক কেন্দ্রিক। ফলে শোষিতের মুখ মূক হয়েই থেকেছে বহুকাল। আধুনিকতার সূর্য উদিত হলে বঞ্চিতের আঁধার আকাশে ধীরে ধীরে আলো আসে।

নিজের কর্মে অবিচল একরোখা মহাশ্বেতা সমাজের একজনের অন্য একজনকে অপর বলা মানুষদের ন্যায়ের পক্ষে দাঁড়িয়েছেন হামেশাই। টালমাটাল অস্থিরতা তাঁর জীবনের একটি অবিচ্ছিন্ন অংশ। শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ঠাণ্ডা ঘরে বসে সাহিত্য সাধনা করার যথেষ্ট অবকাশ রইলেও তিনি বেছে নিয়েছিলেন রূঢ় বাস্তবের জল-মাঠ-জঙ্গল। বাংলা সাহিত্যের তিনি একজন যথার্থ গবেষক কথাকার। মহাশ্বেতা দেবীর রাজনৈতিক অবস্থান তাঁর লেখালেখির মধ্যে অত্যন্ত স্পষ্ট রূপে প্রতিভাত হয়েছে প্রতিনিয়ত।

> "তবে তিনি বলতেন, 'আমি গান্ধিবাদী।' আবার আরেক সাক্ষাৎকারে স্পষ্ট বলেছেন, ম্যায় কমিউনিস্ট হুঁ বামপন্থীও সে মেরা লাগাঁও। একদিকে ম্যাক্সিম গোর্কি তাঁর প্রিয় লেখক, অন্যদিকে লিও তলস্তয় তাঁকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছেন।"[৩]

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, মহাশ্বেতা দেবী নিজেকে বামপন্থী বলে পরিচয় দিলেও দলীয় রাজনীতির ঘেরাটোপে জড়াননি নিজেকে তেমনভাবে এবং প্রতিষ্ঠিতরূপে দলীয় তকমা না থাকার সুবাদেই ২০০৭ সালে বামপন্থী সরকারের শিল্পের জন্য জমি অধিগ্রহণ নীতির বিরুদ্ধে রাস্তায় নামতেও দ্বিধাবোধ করেননি।

মহাশ্বেতা দেবীর ছোটগল্পগুলি এক-একটি জীয়ন্ত মনোলিথ। অর্থাৎ এক একটি প্রস্তরের স্তম্ভ। যা কালের নিরিখে সত্যতা বজায় রেখে subaltern দের পক্ষে রুখে দাঁড়িয়েছে সমাজের তথাকথিত সভ্য মানুষদের অত্যাচার ও তাদের সৃষ্ট জাতি বৈষম্যের বিরুদ্ধে। আর মহাশ্বেতা দেবীর প্রোলিফিক লেখক জীবন সহায় হয়েছে তাঁর এই উদ্দেশ্য সাধনে। বর্তমানে আমরা তাঁর লেখা দুটি ছোটগল্প অবলম্বনে সর্বকালের ইতিহাসের দিকে নজর ফেরাবার চেষ্টা করবো। আলোচ্য দুটি ছোটগল্প 'আজীর' ও 'স্তনদায়িনী সম্পর্কে 'মহাশ্বেতা দেবীর ছোটগল্প' গ্রন্থে 'লেখকের কথা' শীর্ষক অংশে লেখিকা নিজেই জানাচ্ছেন, এই দুটি ছোটগল্পের ইতিহাস সর্বকালের। গল্প দুটির কাহিনি পরম্পরায় নিহিত রয়েছে দাসপ্রথা এবং বড়লোকি আদব-কায়দায় বাড়ির বৌদের সন্তান উৎপাদনের পর শারীরিক ক্যারিস্মাটিক আবেদন যাতে বজায় থাকে সেজন্য দুধ-মা নিযুক্ত করা এবং সেই দুধ-মা দের শেষাবধি করুণ পরিণতি।

'আজীর' ছোটগল্পটির মধ্যে মহাশ্বেতা দেবী আজীর শব্দের অর্থটি আলাদাভাবে খোলসা করেছেন, -

> "অতি অল্প অর্থের জন্য আত্মবিক্রয়কারী।"[৪]

'আজীর' গল্পটি রচনা প্রসঙ্গে মহাশ্বেতা দেবী জানাচ্ছেন, -

> "আজীর গল্পটি উলো-বীরনগরের মুস্তফি বংশের ইতিহাসে মুদ্রিত এক আত্মবিক্রয়কারী দাসের দাসপাট্টা দেখে মনে আসে।"[৫]

গল্পের কাহিনির প্রবাহধারার দিকে নজর রাখলে আমরা দেখতে পাই, সজনলাল ও ভুবনদাসীর মেয়ে ভুনিকে বিয়ে করার তীব্র ইচ্ছে প্রকাশ পেয়েছে আজীর বংশের বংশধর, পাতনের। লালমাটির টোঙাঘরের মালিক সজনলাল। তার টোঙাঘরের নিচের খোঁড়লে ছাগল থাকে আর ওপরে মানুষ। টোঙাঘরের মাথায় তালপাতার টোপ চাল। অর্থাৎ, অসহ্যকর অভাবের বিরাট চিত্র নিয়েই আত্মপ্রকাশ করেছে সজনলালের সংসারটি; তবুও কোনোভাবেই নিজের চৌদ্দ বছর বয়সের মেয়ে ভুনির সঙ্গে পাতনের বিয়ে দিতে নারাজ পিতা সজনলাল। "তিন সম্‌ঝে ভাত দুধ, বছরে দুখানা বস্তর"[৬] -পাতনের জন্য বরাদ্দ করেছে পাতনের মনিব মাতং শুঁড়। এতে পাতনের নির্দ্বিধায় চলে যায় দিন, হয়তো বিয়ে করলেও চলে যেতে পারে জীবন বাধাহীনভাবে। কিন্তু সজনলাল ও ভুবনদাসীর পাতনকে মেয়ে দেওয়াতে অনীহা ঐ একটি কারণের জন্যই, -

> "...তুমি তুমার মালিক লও। তুমার মালিক মাতং শুঁড়।"[৭]

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 24
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 182 - 188
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

পাতন নিজে আজীর হয়নি, আজীর হয়েছিল তার পিতৃপুরুষ। পাতনের পিতৃপুরুষের জোতজমি ছিল না, গ্রামের একান্তেই ওদের বসবাস। খরার দিনে ঘাস পাতা, খেতের শস্য সহ জঙ্গলের বড়ো বড়ো গাছও শুকিয়ে জ্বলে যাচ্ছিল যেবার, সেবার পাতনের পূর্বপুরুষ গোলক কুড়া ও গৈরবী দেবী নিজেদের প্রাণ বাঁচাতে দোরে দোরে ফিরে বলেছিল, -

"আমাদের কিনবে গো? মোরা স্তিপুরুষ, য্যামন রাখবে ত্যামন থাকব, শুধু দু মুঠ ভাত চাই।"[৮]

এই সময় মাতঙ্গ শুঁড়ের পূর্বপুরুষ রাবণ শুঁড়ি ওদের মাথায় ছাদ দেয়, পেটে দেয় ভাত-জল আর তার সঙ্গে পরণে কাপড়। সময় নিয়ত পরিবর্তনশীল। কাজেই খারাপ সময়ের একদিন পরিবর্তন ঘটে। বৃষ্টি নামে, পৃথিবী সবুজ হয় আবার। কার্তিকে আমনের গন্ধ বাতাসে চাউর হলে গোলক কুড়ারা বাড়ি ফিরে যেতে চাইলে রাবণ শুঁড়ি আজীর হওয়ার প্রস্তাব রাখে। বংশধর পরম্পরায় ভাতের অভাব হবে না এই ভেবে প্রস্তাবে রাজী হয় গোলক কুড়া। তারপর ঘটে দলিল দস্তখত। মানুষের প্রাণাধিক প্রিয় স্বাধীনতা। কিন্তু খরা আকালের দেশে পাতনের পূর্বপুরুষ পেটের জ্বালা মেটাতে দুমুঠো ভাতের বিনিময়ে স্বাধীনতার পাশাপাশি নিজেদেরও বেচে দেয়, শেষমেশ আজীর হয়। ক্ষুধা তৃপ্তির বিনিময়ে পাতনের পূর্বপুরুষ তার উত্তর পুরুষদের স্বাধীনতাকেও বিসর্জন দেয় তিন টাকার বিনিময়ে মাতঙ্গের পূর্বপুরুষের কাছে গ্রামের পাঁচজন সাক্ষী রেখে তুলোট কাগজের পাট্টা লেখনীতে।

রোটি-কপড়া-মকানের বন্দোবস্ত গল্পের ইতিহাসকে মজবুত ভিতে দাঁড় করাবার পর শুরু হয় আরেকটি অন্য স্তর। আসলে জীবনের প্রাথমিক নিরাপত্তা মিটলে যে কোনো প্রাণীই ছোটে কামনার পেছনে। এ প্রসঙ্গে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'প্রাগৈতিহাসিক' ছোটগল্পটির কথা মনে আসে পাঠকদের। সেখানে ভিখুর পেটের ক্ষুধার নিবৃত্তি হলে সে ছোটে কামের পেছনে। যেন-তেন-প্রকারেণ পেতে চায় নারীসঙ্গ। এবং শেষমেশ সহায় হয় পাঁচী। তবে এক্ষেত্রে পাতন সামাজিকতার পরিচয় দিয়েছে, গল্পের শুরুতেই আমরা দেখতে পাই, সে বিয়ে করতে চেয়েছে ভুনিকে। গল্পের ঘটনা পরম্পরায় দেখা যায়, ভুনিকে বিয়ে করতে চাওয়ার আগে পাতন বিয়ে করতে চেয়েছিল এক বেদেনীকে। ভরদুপুরে রাজার দিঘিতে স্নান করে পাতনকে দেখিয়ে দেখিয়ে কাপড় ছেড়ে পরেছিল সেই নির্লজ্জ বেদেনী। পাতন তার যৌন আবেদনী মস্করায় আপ্লুত হয়ে তাকে বিয়ের প্রস্তাব দিলে, সে রাজী হয়নি। না হওয়ার কারণ, পাতন আজীর। পিতৃপুরুষের আজীর পাট্টার সংস্কার পাতনের মনে বদ্ধমূল। কিন্তু বিয়ের স্বপ্ন এবং বেদেনীর কথা রাখতে সংস্কার ভুলে একবার সে পালিয়ে যেতে চেয়েছিল। পাতনের চাওয়াদের পাওয়া হয়ে ওঠে না। এ যেন মাতঙ্গের ঔপনিবেশিক পাতনের কোনোভাবেই রেহাই নেই! ধরা পড়ে সে। উঠোনে পাতনের হাত-পা বেঁধে নারকোলদড়ির চাবুক দিয়ে নির্মমভাবে মেরেছিল মাতঙ্গ এবং পাতনের মনে সংস্কারের বদ্ধমূলতাকে আরো দৃঢ় করবার লক্ষ্যে বলেছিল, -

"মহাপাপী বেটা! তু পালালে তুর পিত্তিপুরুষের মুখ পোড়ে না? তু জানিস না তু আজীর?"[৯]

এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ্য, শুধুমাত্র স্বাধীনতাহীনতাই নয়, পাতনের উপর নির্যাতনের অধিকারও যেন আদায় করেছিল মাতঙ্গ আজীর পাট্টার বিনিময়ে। শুঁড়িখানার চাকর বেচন। তার দুটো বৌ, একপাল ছেলে মেয়ে। পাতন-বেচনের কথোপকথনে জানা যায়, আগে পেটে ভাত, পরনে কাপড় দেখে পাতনের পূর্বপুরুষদের বিয়ে হলেও এখন আর কোনো কাঙাল ভিখিরিও কারোর গোলাম হতে চায় না। যে আজীর পাট্টাকে একসময় আশীর্বাদ মনে করেছিল গোলক কুড়া, মনে করেছিল এই পাট্টার দরুন তার সন্তানদের দুধে-ভাতে রাখবার বর প্রদান করে দিয়ে যাচ্ছে সে; সেই আজীর পাট্টাকেই পাতনের অভিশাপ মনে হয়। বেচন তাকে আজীর পাট্টার তুলোট কাগজ চুরি করার পরামর্শ দিয়েছে, সিন্দুকের টাকার থলিটিকে বাজেয়াপ্ত করে নিতে বলেছে, তারপর দুজনে অন্য দেশে দোকান করে জীবন অতিবাহিত করার কথা চিন্তা করেছে। কিন্তু সংস্কারমনা ভীরুতা পাতনকে দুর্বল করেছে প্রতিনিয়ত।

পাতনের মনে সামাজিকতা এবং সংস্কারের গেরো উপস্থিত রইলেও মাতঙ্গের স্ত্রীর মনে সে বালাই নেই। মাতঙ্গের স্ত্রীর যৌন অতৃপ্তির কথা পরতে পরতে বর্তমান। এই অতৃপ্তির মূল কারণ মাতঙ্গের বয়স এবং যৌনতায় তার অপারদর্শীতা। মেয়ের বয়সী বৌ মাতঙ্গের। তাই তার অপছন্দ। মাতঙ্গ বাড়িতে থাকলে মাতঙ্গের স্ত্রী সাজে না, অথচ পাতনের মনিব বাড়িতে না থাকলে সর্বশরীরে সোনা-রুপোর আভরণে নিজেকে সাজিয়ে পাতনের কাছে এসে তাকে জিজ্ঞেস করে, কেমন দেখাচ্ছে তাকে? প্রত্যুত্তরে পাতন একটি শব্দে 'ভাল' বলে ক্ষান্ত হতে চাইলে পরক্ষণেই মাতঙ্গ পত্নী নিজের তুলনা টানে,

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 24
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 182 - 188
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

সজনলালের মেয়ে এবং সেই নির্লজ্জ বেদেনীর। পাতনের উত্তরে তার সংস্কার বর্তমান রয়েছে। সে জানিয়েছে, সে মাতঙ্গ পত্নীকে মাতৃভাবে দেখে। এ প্রসঙ্গে অপুত্রক মাতঙ্গ পত্নীর মনে পাতনের প্রতি প্রবল একতরফা অবৈধ প্রণয় প্রকাশিত হয়েছে অনেকবার। 'দলেমলে' যৌবনের অধিকারী মাতঙ্গ পত্নী নিজেকে আর পাতনকে এক সারিতে রেখেছে, তারা দুজনই মাতঙ্গের গোলাম। তাই এই যন্ত্রণাময় জীবন ছেড়ে পাতনের মুক্তির মধ্যেও মিলবে মাতঙ্গ পত্নীর মনে শান্তি। আর এই শান্তি প্রাপ্তির জন্য সে পাট্টা চুরি করে পাতনকে পালাতে সাহায্য করবে—এতে পাপ হলেও মাতঙ্গ পত্নী করবে; প্রয়োজনে গঙ্গায় স্নান করে নেবে। পাট্টা চুরি এবং পাতনের বউকে গয়না দেওয়ার বিনিময়ে মনিব মাকে গঙ্গায় নিয়ে যেতে হবে পাতনকে— এই শুধু তার চাওয়া। তবে সজলালের মেয়েকে বিয়ের প্রসঙ্গে কোথাও যেন একটা অন্তরায় মিশেছিল মাতঙ্গ পত্নীর। পাতনের ভুনিকে বিয়ে করার ব্যাপারে তার মনে জেগেছে একটা কিন্তু ভাব,— "ভুনি রুগা-ভুগাটা।"[১০] পাতন এসব মানতে নারাজ, সে খাইয়ে-মাখিয়ে ভুনিকে করে নেবে নিজের মনোমত।

দীর্ঘ বারো বছরের গোলামির জীবনে পাতনের সঞ্চয় পাঁচ কুড়ি টাকা এবং মনিব-মা তাকে দেবে গয়না। এই দুইয়ের বলে সে সজনলালের মেয়েকে বিয়ে করবে বলে জানিয়েছে। কিন্তু শর্ত ঐ একখানা, আজীর পাট্টা থাকা চলবে না। অতএব যে ভাবেই হোক সংস্কার মনা পাতনের সে আজীর পাট্টাকে নষ্ট করতে হবে। মাতঙ্গ পত্নীর দিন দিন শরীর খারাপ হতে করে। সময়ে-অসময়ে মূর্ছা যায়। তাই মৃত্যুর আগে সে দেখে যেতে চেয়েছে গোলাম জীবন মুক্ত পাতনকে। সুযোগ বুঝে একদিন ঝড়-বাদলের রাতে, মনিব মা 'মহাপাতকী' করে বসলেন। গ্রামের নষ্ট মেয়ে পুন্নশশীর উদোম নৃত্যে যখন মাতঙ্গ মশগুল তখন গায়ে যৌবনের উত্তাল করা মাতাল গন্ধ নিয়ে মাতঙ্গ পত্নী পাতনকে ডেকে তুলেছে ঘুম থেকে। পাতনকে সঙ্গী করে মাতঙ্গ পত্নী আজীর পাট্টা আর গয়না নিয়ে পালায়। বহুদূর যাবার পর দম নিতে চেয়ে যখন দাঁড়িয়েছে মাতঙ্গ পত্নী, তখন খোলসা করেছে তার চাওয়া। সে নিজেকে সঁপে দিতে চেয়েছে পাতনের কাছে। পাতনের মনেও ভক্তিভাব সরে যেতে বসেছে ধীরে ধীরে। নারী-পুরুষের আদিমতম সম্পর্ক তুষের আগুনের মতো যেন জ্বলে উঠেছিল। কিন্তু পাতনের কাছে সংস্কার সর্বপ্রথমে। সামাজিকতার সংস্কার; আজীর পাট্টার সংস্কার। মাতঙ্গ-পত্নী সর্বত্র খুঁজলেও শেষ পর্যন্ত খুঁজে পায়নি সেই আজীর পাট্টা। কেন না, দু-পুরুষ আগেই তুলোট কাগজ কালের ঝড়-ঝাপটায় জীর্ণ হয়ে নষ্ট হয়ে গেছে।

পাতন তার পূর্ব সংস্কারে বাঁধা। তাই যৌবনে মত্ত নারীকে সামনে পেয়ে, সুন্দর ভবিষ্যতের পথে পা না বাড়িয়ে আঁকড়ে ধরেছে তার জগদ্দল সংস্কারকে। সংস্কার থেকে মুক্তি মিললে, তবেই সে বেছে নেবে মুক্ত পৃথিবীকে। মাতঙ্গ পত্নীর ভালোবাসার চাইতে আজীর পাট্টার গুরুত্ব পাতনের কাছে বেশি। কাজেই ক্রুদ্ধ পাতনকে ভালোবেসে জড়িয়ে ধরতে চাওয়া মাতঙ্গ পত্নীকে পাতন ঠেলে সরিয়ে দিতে চেয়েছে, প্রথমে না পেরে উঠলেও পরে গলা টিপে ধরেছে। আর এতেই শেষ হয়েছে মাতঙ্গ পত্নীর জীবন। এরপর সংস্কারে বাঁধা পাতনকে হাতকড়া দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে থানায়। লেখিকা এখানেই শেষ করেছেন তাঁর গল্প এবং তুলে দিয়েছেন দাসপ্রথার বিরুদ্ধে তীব্র তীক্ষ্ণ জোরালো কণ্ঠটি। তবে দাস প্রথার বিরুদ্ধে তাঁর কণ্ঠটি যতখানি জোরালো হয়েছে, ততখানি জোরালো হয়নি মাতঙ্গের পত্নীর হয়ে সওয়ালে। তিনি খুব সচেতনভাবেই এড়িয়ে গেছেন মাতঙ্গ পত্নীর নাম। সারা গল্পজুড়ে তিনি কখনো মনিব মা কিম্বা কখনো মাতঙ্গ পত্নী হয়েই থেকে গেছেন। মাতঙ্গ পত্নী নিজস্ব কোনো পরিচয় পাননি। নারীর হয়ে সওয়ালে মহাশ্বেতা দেবী অগ্রসারীর একজন লেখিকা হলেও, এই গল্পের নিরিখে তাঁর এই খামতি লক্ষ্য করার মতো। তবে এর জন্য গল্পের সার্বিক ঘটনাপুঞ্জ শুধু একটি নির্দিষ্ট কালের মধ্যে আটকে পড়েনি। 'আজীর' হয়ে উঠেছে সর্বকালের ইতিহাস।

আমাদের পরের আলোচ্য গল্প, 'স্তনদায়িনী'। উনিশ শতকের শেষ ও বিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলা ছোটগল্পে রোম্যান্টিকতার প্রাবল্য লক্ষ্য করা যায়। সেখানে নিম্নবর্গীয়দের জীবনেও রোম্যান্টিকতার সুর সুস্পষ্ট। সেই ধারায় মহাশ্বেতা দেবীও হেঁটেছেন তবে সর্বতই রোম্যান্টিকতার পথকে বেছে নেন নি। লেখক জীবনের প্রথম দিকে তিনি এই ধারায় বহু গল্প ও উপন্যাস লিখেছেন। কিন্তু প্রাণের তাগিদে যখন কলম ধরেছেন, তখন সমাজের অন্তেবাসী মানুষদের রোম্যান্টিকতার বদলে সংগ্রামশীল জীবনকেই উপজীব্য করেছেন কলমের খোঁচায়। তীক্ষ্ণ এবং নির্মেদ ভাষায় হাজির করেছেন সমাজের রূঢ় বাস্তবকে। প্রধানত গল্পের মধ্যে গল্পকথক বা ন্যারেটারের ভূমিকায় নিজেকে রেখে কাহিনির বিস্তার করেছেন লেখিকা, — এইটি তাঁর গল্পের এক বিশেষ বিশেষত্ব। 'স্তনদায়িনী' গল্পটি সম্পর্কে মহাশ্বেতা দেবীর মূল্যায়ন বেশ স্পষ্ট। তিনি

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 24
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 182 - 188
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

যশোদাকে আমাদের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ বলে মনে করেছেন আর ক্যানসারের বিষয়ে জেনে নিয়েছেন ডাক্তার টম চৌধুরীর কাছ থেকে। পশ্চিমবঙ্গ দিয়েই এসেছে সবদিন, আর প্রয়োজনের বেলা পাশে পায়নি কাউকে, সে বেলা ভাঁড়ার শূন্য। এই রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিটি গল্পের তীর্যক অর্থ বিশ্লেষণে আমাদের সহায়তা করবে।

কৃতজ্ঞতা নামক বৈশিষ্ট্যটি অন্যান্য প্রাণীদের মধ্যে যতখানি উজ্জ্বল, মানুষের মধ্যে ততখানি নয়। সৎ, উচিত ইত্যাদির আদর্শবাণী, নিমেষে নিঃস্ব হয়ে যায় বাস্তবের মাটিতে। ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে 'এক্ষণ' পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়া 'স্তনদায়িনী' গল্পে কাঙালীচরণের বৌ যশোদা, হালদার বাড়ির প্রায় সমস্ত সন্তানদের মুখে নিজের বুকের রক্তকে স্তন্য করে তুলে দিয়েছে। অথচ শেষাবধি ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে মারা গেলেও হালদার বাড়ির তরফ থেকে মেলেনি কোনো সাড়া। কেন না রাতের বেলা ওঁদের ফোন ডিসকানেকটেড করা থাকে।

'স্তনদায়িনী' গল্পের মূল চরিত্র যশোদা। সে "...পেশায় জননী, প্রোফেশ্যনাল মাদার।"[১১] একে একে কাঙালীচরণের যৌনসুখ, ভরদুপুরে হালদার বাড়ির ছোট ছেলের রাঁধুনির সঙ্গে যৌন চাহিদার তৃপ্তিপূরণ এবং পরবর্তীতে কেচ্ছার ভয়ে রাঁধুনিকে চোরের অপবাদে বিতাড়ন, হালদারদের ছেলের দ্বারা কাঙালীর পায়ে দুর্ঘটনা, হালদারকর্তার টাকার সহযোগিতায় ক্রাচ সহযোগে ফিরে আসা অথবা দুর্ঘটনা থেকে ফিরে এলে কাঙালীর যশোদাকে নবীন পাণ্ডার সঙ্গে সন্দেহ করা ইত্যাদি একের পর এক ঘটনা প্রবাহকে গল্পের মধ্যে ন্যারেটারের ভূমিকায় মহাশ্বেতা দেবী নিজেই বর্ণনা করেছেন সুনিপুণভাবে। যশোদার চরিত্র সতীর ছাঁদে গড়েছেন লেখিকা। অসুস্থ স্বামীর সুস্থতা কামনায় যশোদা "...মায়ের মন্দিরে হত্যা দিয়েছে, সুবচনীর ব্রত করেছে, চেতলা গিয়ে সিদ্ধ বাবার চরণ ধরেছে। অবশেষে সিংহবাহিনী স্বপ্নে ধাইয়ের বেশে বগলে ব্যাগ নিয়ে এসে তাকে বলেছেন, 'ভাবিসনি। তোর সোয়ামি ফিরে আসবে।'..."[১২] আর এখান থেকেই গল্পের মূল স্রোতে পরিবর্তন আসে। ধাইয়ের বেশ আসলে যে ধাত্রীর, পালনকর্ত্রীর। এ যেন ইঙ্গিত হয়ে দাঁড়িয়েছে যশোদার সংসারের ছেলে-মেয়েদের লালন-পালনের। যতদিন না কাঙালী সুস্থ হয়ে দোকান দিতে পারছে হালদার কর্তার সাহায্যে, ততদিন অবশ্য সিধা আসে কাঙালীর বাড়িতে।

হালদারকর্তা হরিসালের মানুষ। ব্রিটিশ সরকারের ডিভাইড অ্যান্ড রুল পলিশির সময়ে হালদারকর্তা টাকা করেছেন। তিনি মানুষের সঙ্গে মানুষের বিভেদকে তেমন আমল দেন না। তার মতে, "ব্রাহ্মণের কি ঘটি-বাঙাল অয়?"[১৩] কাঙালীর দুর্দিনে হালদারকর্তাই তার সহায় হয়েছে। কিন্তু হঠাৎ একদিন হার্টফেল করে হালদারকর্তা মারা গেলে, কাঙালী ও যশোদার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে। এই কাহিনিটি বর্ণনায় ন্যারেটার মহাশ্বেতা দেবীর পড়াশুনোর অধ্যাবসায় প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর ভাষায়, -

> "কাঙালী ও যশোদার মাথায় শেক্ষপীরের ওয়েল্‌কিন ভেঙে পড়ে।"[১৪]

এছাড়াও গল্পের মধ্যে বহু জায়গায় মহাশ্বেতা তাঁর গবেষক-লেখক ও অসম্ভব ভালো পাঠক হওয়ার মুন্সীয়ানা দেখিয়েছেন।

হালদারকর্তার মৃত্যুতে কাঙালীর অবস্থা আরও করুণ হয়। সংসারের হাল ধরতে কাঙালী অক্ষম হলে নিয়তির নিয়ম মতো যশোদা এগিয়ে আসে। হালদারবাড়িতে তখনও পর্যন্ত ৬ টি ছেলের বিয়ে হয়েছে। এবং পূর্বে উল্লেখিত এ বাড়িতে ষোড়শ শতকের নিয়ম মেনে একের পর এক ছেলে-মেয়ে জন্ম নেয়। কাজেই ঘরের ভেতরে যে আঁতুড় ঘর বর্তমান, তা কখনও খালি থাকে না। বাড়ির বৌদের শারীরিক আকর্ষণ যেন বজায় থাকে, সেই কারণে ক্ষমতাবান কর্তারা তৎকালীন নিয়মে তাদের বাড়ির নবজাতকদের জন্য বরাদ্দ করত দুধ মা। সংসারের নেতৃত্ব যখন যশোদাকেই নিতে হয় তখন যশোদা দুধ মায়ের পেশাটাকেই দক্ষতার সঙ্গে পালনে এগিয়ে আসে। যশোদা হালদার বাড়িতে ঐ পেশায় ঢুকবার সময় যশোদা তিন সন্তানের মা ছিলেন। আর যখন সেই পেশা থেকে অব্যহতি পেলেন তখন তার নিজের বয়স তিরিশ এবং তার নিজের সন্তানের সংখ্যা কুড়ি। অর্থাৎ প্রায় দু-দশক আঁতুড়ে কেটেছে যশোদার। আর হালদার বাড়ির বৌয়েরা বারো-তেরো-চৌদ্দটি সন্তানের জন্ম দিয়ে ক্ষান্ত হলেন। তাদের বংশের নিয়ম ছিল, কুড়িটি সন্তান হলে স্বামী-স্ত্রীর আবার বিয়ে হবে। কিন্তু বৌয়েদের তা না হওয়ায় বংশের নিয়ম প্রতিফলনের জায়গা পায়নি।

ইতিমধ্যে হালদারকর্তার পর হালদারগিন্নিও একসময় মারা গেলেন। বাড়িতে মেম্বার সংখ্যা অগণিত হলে বাড়িতেও ভাঙন ধরে এবং অন্নের সংস্থানে সংকট প্রকট হতে শুরু করে। শুধু যশোদার সঙ্গেই যেন ভাগ্যের বিড়ম্বনা ক্রমশ

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 24
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 182 - 188
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

বৃহৎ থেকে বৃহত্তরের দিকে হাতছানি দেয়। কাঙালী নবীনের বোনঝির সঙ্গে এক অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। হালদারবাড়ির পুরানো ঝি বাসিনীর সঙ্গেও ঝগড়ার পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। গল্পের মধ্যে দেবতাদের প্রতি মানুষের অন্ধভক্তির বিষয়টিকে লেখিকা খুব একটা ভালো দেখাননি; গল্পের মধ্যে আমরা দেখতে পাই, সিংহবাহিনী দেবীর মুখ ঘুরিয়ে এবং তারপর আবার ঠিক করে নবীন ভাল পয়সা রোজগার করেছে লোক ঠকিয়ে মাহাত্ম্যের নামে। পরবর্তীতে একলা যশোদা যেন আরও একলা হয়েছেন হালদারবাড়িতে। বাম স্তনে টিউমার রূপে বাসা বেঁধেছে মারণ রোগ ক্যানসার। ডাক্তার ক্যানসার হাসপাতালে দেখাতে বললেও হালদারবাড়ির বড়বাবু তেমন আমল দেন নি। হালদারবাড়ির বড়বাবু সম্পর্কে গল্পকারের অভিমত, -

> "...তাঁর মগজের বুদ্ধি-কোষ অষ্টাদশ এবং প্রাক্-রেনেসাঁস উনিশ শতকীয় অজ্ঞানের অন্ধকারে ঢাকা।"[১৫]

তিনি মনে করেন, -

> "উচ্চ বংশ, দেবদ্বিজে ভক্তিমান বংশে ও রোগ (বসন্ত) হয় না।"[১৬]

এর পরের কাহিনি বেশ মর্মদায়ক। গোলাপী কাঙালীকে ঠকালে সে আবার ফিরে আসে যশোদার কাছে। কিন্তু যশোদার শরীরে যে মারণ রোগ থিতু হয়েছে তার প্রভাব সারা শরীরকে ক্রমশ শক্তিহীন করে তুলেছে। পঞ্চাশটা শিশুর মুখে যে দুধ জুগিয়েছে তার চরম পরিণতির দিনে তার মুখে জল দেওয়ার মতো তার পাশে কেউ ছিল না। সমাজের এই নির্মম দিকটি মহাশ্বেতা দেবীর কলমে সর্বকালের ইতিহাস হয়ে রয়ে গেল। গল্পের শেষ দুটি লাইনে ন্যারেটার মহাশ্বেতার দার্শনিক বক্তব্য সামনে এসেছে, -

> "যশোদা ঈশ্বর-স্বরূপিণী। ...যশোদার মৃত্যুও ঈশ্বরের মৃত্যু। এ সংসারে মানুষ ঈশ্বর সেজে বসলে তাঁকে সকলে ত্যাগ করে এবং তাঁকে সতত একলা মরতে হয়।"[১৭]

আর এভাবেই শেষ হয় যশোদা এবং 'স্তনদায়িনী'।

Reference:

১. দেশ, ১৭ জানুয়ারি ২০২৬, বর্ষ ৯৩, সংখ্যা ৬, সম্পাদক জয়শ্রী রায়, পৃ. ১০৯
২. ঐ, পৃ. ১১২
৩. কৃত্তিবাস, বিশেষ যুগ্ম সংখ্যা, ১ ও ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৩, বর্ষ ৮, সংখ্যা ৫-৬, সম্পাদক বীজেশ সাহা, পৃ. ১০৪
৪. মহাশ্বেতা দেবীর শ্রেষ্ঠ গল্প, প্রমা, ৫ ওয়েস্ট রেঞ্জ, কলকাতা- ১৭, পৃ. ৫
৫. ঐ, পৃ. ৫
৬. ঐ, পৃ. ২০০
৭. ঐ, পৃ. ২০০
৮. ঐ, পৃ. ২০৪
৯. ঐ, পৃ. ২০৭
১০. ঐ, পৃ. ২১২
১১. ঐ, পৃ. ২১৯
১২. ঐ, পৃ. ২২২
১৩. ঐ, পৃ. ২২৪
১৪. ঐ, পৃ. ২২৪
১৫. ঐ, পৃ. ২৩৯
১৬. ঐ, পৃ. ২৩৯
১৭. ঐ, পৃ. ২৪৭